ATHENA, VOLUME X, JULY 2026 C.E. (ISSN: 2454-1605), pp. 163-168
www.athenajournalcbm.in

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে রামায়ণের অনুষঙ্গ

ভবেশ মজুমদার*

প্রাপ্ত: ৩০.১২.২০২৫ পরিমার্জন: ২১.০৪.২০২৬ গৃহীত: ২৫.০৫.২০২৬

সারসংক্ষেপ: *মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারায় রামকথার সন্নিবেশ হয়েছে অনিবার্য ভাবে। চণ্ডীমঙ্গলের কবিরাও প্রভাবিত হয়েছিলেন রামায়ণের আদর্শে। কবিরা চরিত্র-চিত্রণে কিংবা ঘটনা-সন্নিবেশে রামায়ণ-কাহিনিকে অস্বীকার করতে পারেননি এবং তা যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক হয়েছে। মূল কাহিনির গল্পরসকে সাহায্য করেছে জমাট বাঁধতে। একটু গতানুগতিক মনে হলেও কবিরা কোথাও যে মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের দিকটি।*

সূচক শব্দ: *ভক্তি, উদ্ধার, পুণ্য, আশ্রয়, সতীত্ব, বেদনা, বনবাস, আদর্শ।*

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সুধীরঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
e-mail: bhabesh.majumder@srlm.ac.in

বাংলাদেশে রচিত রামায়ণ-কাহিনি মূলত গেয় ও পাঁচালি কাব্য হলেও সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এর প্রভাব অনস্বীকার্য। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য শাখাগুলির সর্বত্রই চরিত্র-চিত্রণে কিংবা ঘটনা-সন্নিবেশে রামায়ণের উল্লেখ রয়েছে। রামকথা ও মঙ্গলকাব্য যেন পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে বাংলাদেশে। সেখানে মানবজীবনের জয়গান করেছেন প্রায় সব কবিই। কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে রামায়ণের কাহিনি জাতীয় সাহিত্যের রূপলাভ করেছে সর্বকালের মানুষের কাছে। এই কাহিনি সব দেশের সব সাহিত্যের কাছেই সমান আদরণীয়। এছাড়াও বলতে হবে সব কবির কাব্যপ্রেরণার মূল উৎস এই কাহিনি। চণ্ডীমঙ্গলের কবিরাও রামায়ণের আদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য দীর্ঘকাল ধরে বাঙালি সমাজে প্রচলিত এবং জনপ্রিয়তার বিচারে উল্লেখযোগ্য। এ কাব্য রামায়ণের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। অনার্য ব্যাধ-দম্পতি কালকেতু-ফুল্লরাকে যেভাবে পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে রামায়ণ ও অন্য পুরাণের রেফারেন্স দিতে দেখি, তাতে কখনোই মনে হয়নি যে কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনি আদৌ অনার্য ব্যাধের জীবনকথা। আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের বিষয়টি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। রামায়ণের প্রতি জ্ঞান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা অনার্য জীবনে তুলে ধরে আসলে গার্হস্থ্য জীবন ভাবনাকেই বড়ো করে তুলেছেন চণ্ডীমঙ্গলের কবিরা।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে 'ভগবতীর মৃগীরূপ ধারণ' অংশে দেখা যায় মৃগীরূপী ভগবতীকে ধরতে কালকেতু পিছু নিলে তরঙ্গের মতো ছুটন্ত মৃগীর নাগাল সে পায়নি। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ লিখেছেন—

এই পাপ মায়ামৃগ   পবন জিনিয়া বেগ
মোরে বিড়ম্বিতে কৈল বিধি।
যেন রাবে বিড়ম্বিতে   আইল কানন পথে
মারীচ যেমন মায়ানিধি।।[১]

মারীচ মায়াবী অনার্য রাক্ষস। রাক্ষসরাজ রাবণের নির্দেশে সে সীতাহরণের কাজে সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করে। হরিণরূপী মারীচ আর্যবীর রামচন্দ্রকে মায়ায় বশ করে তার পিছু নিতে বাধ্য করেছিল। কালকেতুও মৃগীরূপী ভগবতীর পিছনে ছুটেছিল তার লক্ষ্যপূরণে। অন্যদিন সে পশুশিকার করে প্রায় বিনা বাধায়। কিন্তু কালকেতু আজ যেন মায়াবী মারীচের পাল্লায় পড়েছে। শিকার না পেলে কালকেতুর সংসার চলবে না।

কালকেতুর ঘরে স্বর্ণগোধিকারূপী ছদ্মবেশিনী চণ্ডীর অবস্থান কালে সপত্নী ভয়ে ভীতা ফুল্লরা তার পরিচয় জানতে চাইলে চণ্ডী নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন শ্লেষের সঙ্গে। ফুল্লরা শুধু এটুকু বুঝতে পারল দেবী উচ্চবংশজাত। ফুল্লরা কোনো ভাবেই মানতে পারেনি যে, ব্যাধের ঘরে চণ্ডী এসেছেন তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে। সে শুধু চায় ষোড়শী সুন্দরীর স্থানত্যাগ। চণ্ডীর প্রতি তার উপদেশ—

রাবণে বধিয়া রাম   সীতারে আনিয়া ধাম
করাইল পরীক্ষা দহনে।
লোক-বাদ খণ্ডিবারে   বনবাস দিলা তারে
আদেশিয়া সুমিত্রানন্দনে।।
পঞ্চমাস গর্ভকালে   সাধ খাওয়াবার ছলে
লয়্যা গেল লক্ষ্মণ কাননে।
শুন গো দারুণ কথা   কাননে এড়িয়া সীতা
আল্যা বীর আপন ভবনে।।[২]

সীতাকে বনে রেখে লক্ষ্মণ একাকী অযোধ্যায় ফিরেছেন লোক-অপবাদ খণ্ডন করতে। ব্যাধগৃহ ত্যাগ না করলে চণ্ডীকেও পরীক্ষার আগুনে প্রবেশ করতে হবে এবং তারও সীতার অনুরূপ দশা হবে। ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে স্থান ত্যাগ করাতে ফুল্লরা শেষ অস্ত্র হিসাবে নিবেদন করে বারোমাসের দুঃখকথা। এতেও দেবীর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না

হওয়ায় ফুল্লরা কাঁদতে কাঁদতে গোলাহাটের পথে চলে, যেখানে সে কালকেতুকে পাবে। পথেই কালকেতু ফুল্লরার উদভ্রান্ত অবস্থা দেখে বিস্মিত হয়। ঘরে শাশুড়ি-ননদ নেই, তবুও কালকেতু ফুল্লরার কান্নার হেতু বুঝতে পারেনি। ফুল্লরা বলে—

কি লাগিয়া প্রভু তুমি পাপে দিলা মন।
যেই পাপে নষ্ট হৈলা লঙ্কার রাবণ।।[৩]

ফুল্লরা বোঝাতে চেয়েছে সীতাহরণ করে রাবণের লঙ্কাপুরী ধ্বংস হয়েছিল। সেই একই ঘটনা তার সংসারেও ঘটতে চলেছে কালকেতু উচ্চবর্ণীয়া অভিজাত কন্যাকে ঘরে নিয়ে আসার জন্য।

কালকেতুর প্রতি ফুল্লরার উপদেশে দেখা গেল সীতাহরণকারী রাবণের লঙ্কা-ধ্বংস কাহিনি—

শুন শুন বীরবর নষ্ট কৈলে গারী-ঘর
পরের রমণী ঘরে আনি।
ইবে তোমায় দেখি আন ধর্ম্মে নাহি অবধান
ইতিহাসে শুন মোর বাণী।।[৪]

রাবণ সীতাকে হরণ না করলে লঙ্কাপুরী ধ্বংস হতো না এমনই মনে করে ফুল্লরা। এক নারীর জন্য তার সুখের সংসার ধ্বংস হোক এমনটি সেও চায় না। ফুল্লরা রামায়ণের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে কালকেতুকে বলেছিল— রামচন্দ্র যখন সীতাকে নিয়ে বনবাসে দিন কাটাচ্ছেন সেই সময় সুন্দরী রাক্ষসী শূর্পণখা নিজেকে নিবেদন করেছিল রামচন্দ্রের কাছে। কিন্তু লক্ষ্মণের হাতে তার নাক-কান কাটা গেল। সংবাদ পৌঁছাল লঙ্কায়। শূর্পণখার কথা শুনে ব্যথিত রাবণ মারীচকে সঙ্গে নিয়ে উপনীত হলো রাম-সীতার কুটির-সম্মুখে। উপদেশ-বাণীতে ফুল্লরাকে বলতে শোনা যায়, সুবর্ণ মৃগরূপী মারীচকে দেখে সীতা মুগ্ধ হলে রামচন্দ্র তাকে গেলেন ধরে আনতে। কুটিরে একাকী লক্ষ্মণ। কিন্তু মায়াবী মারীচের কৌশলে কুটির ছাড়তে বাধ্য হলো অনুজ লক্ষ্মণ। সেই সুযোগে সীতাকে হরণ করল সন্ন্যাসীবেশী রাবণ। তাকে রাখা হলো লঙ্কার অশোক কাননে। এরপর সীতা-উদ্ধারের জন্য রাম-লক্ষ্মণ সুগ্রীব-অঙ্গদসহ বানরসৈন্য নিয়ে লঙ্কাপুরী অবরোধ করলে শুরু হলো রাম-রাবণের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে মারা গেল কুম্ভকর্ণ-সহ বহু রাক্ষসবীর। সীতার কারণে সবংশে ধ্বংস হলো রাবণ এবং সীতা-উদ্ধারের পর লঙ্কার সিংহাসনে বসলেন বিভীষণ। ফুল্লরা কখনোই চায়নি এক ষোড়শীর কারণে তার সংসার নষ্ট হোক।

কালকেতু ফুল্লরাকে নানাভাবে বোঝায় যে, সে পরের রমণী ঘরে আনেনি। তার ভালো-মন্দ সব কিছুই হলো ফুল্লরা। পরস্ত্রীকে সে মাতৃজ্ঞানে দেখে। ফুল্লরাকে কালকেতু প্রতিশ্রুতি দিল সেই কন্যাকে দেখাতে পারলে তাকে প্রাণে মারবে এক শরে। কালকেতু ঘরে ফিরে সেই কন্যাকে দেখল। ষোড়শী সেই কন্যাকে নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তনের কথা জানিয়ে কালকেতু তাকে অপযশ থেকে মুক্ত হতে বলল এবং সীতার রাবণপুরীতে থাকা ফলের কথা তুলে ধরল—

সীতা যে পরম সতী তার শুন দুর্গতি
দৈবে ছিল রাবণ ভবনে।
উদ্ধারিয়া সীতা আনি লোকবাদে রঘুমণি
পুনর্ব্বার পাঠাল্য কাননে।।[৫]

সীতা পরম সতী হয়েও লঙ্কাপুরীতে থাকার জন্য দুর্ভোগের শিকার হয়েছিল। সীতা উদ্ধারের পরও লোক-অপবাদের জন্য রামচন্দ্র পুনর্বার বনবাসে পাঠান। ব্যাধের ঘরে থাকার জন্য এই দেবীরও একই অবস্থা হওয়ার কথা ভাবে কালকেতু। বাঙালি কবি দুঃখের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নারীচরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে নারীর সতীত্বের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সীতার দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছেন। মধ্যযুগের বাংলার সমাজে নারীর সতীত্ব পরীক্ষার মতো কু-প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলীন্য প্রথার ফলে। কবিকঙ্কণের প্রায় একশ বছর আগে কৃত্তিবাস বাংলার সমাজের এই প্রথাটিকে সীতার অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে আমাদের কাছে তুলে ধরেছিলেন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খণ্ডের একেবারে শেষ দিকে কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধে কালকেতু পরাস্ত হলে ফুল্লরা কালকেতুকে গুজরাট রাজ্য ত্যাগ করতে বলে। তার কাছে পূর্বের জীবনই ভালো ছিল। কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধে কালকেতুর

বিজয় যখন একপ্রকার নিশ্চিত তখন কোটালের পুনর্বার যুদ্ধে আগমনবার্তা সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছিল কালকেতুর মনে। সেই পরিস্থিতিতে ফুল্লরা শুধুমাত্র বাঁচার জন্য রামায়ণের বালিবধের প্রসঙ্গ টেনে কালকেতুকে যুদ্ধে নিস্পৃহ করতে চেয়েছে।

কহি আমি সবিশেষ   যদি না ছাড়িবে দেশ
শুন রামায়ণ-ইতিহাস।।[৬]

রামায়ণের ইতিহাস বলছে, বালি-সুগ্রীবের যুদ্ধে সুগ্রীব বারবার পরাজিত হলেও রামচন্দ্র অন্তিম বার সুগ্রীবকে বালির সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলেন। সুগ্রীব বালিকে পুনর্বার যুদ্ধে আহ্বান করলে বালিকে কৌশলে হত্যা করেন রামচন্দ্র। বালি স্ত্রীর উপদেশকে গুরুত্ব দেয়নি।

বালিরে বিড়ম্বে বিধি   না ধরে জায়ার বুদ্ধি
সমরে পড়িল রাম-শরে।
ফুল্লরার কথা রাখ   কতক কাল জীয়া থাক
না যাইহ রাজার সমরে।।[৭]

ফুল্লরার চিন্তা হলো দুর্বল যখন পরাজিত হয়েও যুদ্ধে আসে পুনর্বার, তখন সেখানে অন্য কৌশল থাকে। সুতরাং কালকেতুর যুদ্ধ থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। বস্তুত অনার্যজীবনে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটিয়ে চণ্ডীমঙ্গলের কবি আখেটিক খণ্ডের আখ্যানটিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন একটা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে।

চণ্ডীমঙ্গলের কবিদের মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ যথার্থ পণ্ডিত ছিলেন। কবিকঙ্কণ জানতেন তাঁর কাব্যের শ্রোতারা পৌরাণিক ও লৌকিক দুই সংস্কৃতিরই রসপুষ্ট। সে কারণে ব্যাধের কাহিনির ফাঁকে ফাঁকে তিনি স্বভাবসিদ্ধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় রেখেছেন পৌরাণিক কাহিনিকে এনে। পৌরাণিক কাহিনির একটি ভার ও গতি আছে। রামায়ণের কাহিনির দিকে দৃষ্টিপাত করলে এ কথার সারবত্তা মেলে। এখানে আমরা বণিক খণ্ডে কবিকঙ্কণ বর্ণিত সগর-বংশ উপাখ্যান, কিংবা সগর-বংশ উদ্ধার ইত্যাদি প্রসঙ্গের কথা বলতে পারি। শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রাকে কেন্দ্র করে যাত্রাপথ মধ্যে মাঝিদের কথোপকথন সূত্রে এসেছে বিভিন্ন পুরাকীর্তির প্রসঙ্গ। মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে থাকলেও রামায়ণের আদিকাণ্ডেও সগর-বংশের উপাখ্যান আছে। কবিকঙ্কণের বর্ণনা থেকে পাচ্ছি, রিপুজয়ী নরপতি সগর অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ছেড়ে দিলে দেবরাজ ইন্দ্র তা লুকিয়ে রাখলেন কপিলমুনির আশ্রমে। সগরের ষাটহাজার পুত্রের কাজকর্মে খুবই বিরক্ত ছিলেন দেবরাজ। অশ্ব হারানোর সংবাদে সগররাজ পুত্রদের নির্দেশ দিলেন—

ঘোড়া আনি দেহ মোরে   পরাণে বধিবে চোরে
মখভার তোমা সবাকার।[৮]

নির্দেশ পালন করতে সগরপুত্রেরা রীতিমত হয়রান এবং ক্রোধান্বিত। শেষ পর্যন্ত তারা অশ্ব খুঁজে পেল কপিলমুনির আশ্রমে। কবিকঙ্কণ লিখছেন—

অশ্ব দেখি তাঁর কাছে   কোপে নৃপসুত নাচে
বকধ্যানে আছে ঘোড়াচোর।
এমত নিন্দিআ তাঁরে   পিঠে শেলঘাত মারে
কোপদৃষ্টে মুনি চায় ঘোর।।[৯]

এর পরের অংশ আমরা সকলেই জানি। সগরপুত্রদের প্রাণ গিয়েছিল মুনির কোপানলে। সগরের পৌত্র অংশুমান কপিলমুনিকে সন্তুষ্ট করে অশ্ব ফিরিয়ে আনলে যজ্ঞ সমাপ্ত হয়।

পৌরাণিক সগর-বংশ উদ্ধারের কাহিনি কবিকঙ্কণ মুকুন্দ পরিবেশন করেছেন এই ভাবে—

শুন রে কাণ্ডার ভাই   তীর্থ বড় এই ঠাঁই
কহিল পুরাণ-ইতিহাস।
সগরবংশের কর্ম   শুনিলে বাড়এ ধর্ম
না থাকে পাপের পরকাশ।।[১০]

এ থেকে বোঝা যায় শ্রীমন্তের যাত্রাপথে সাগরসঙ্গমে এসে সগর-বংশ উদ্ধারের কাহিনি শুনিয়ে পুণ্যের কাজ করতে চান কবিকঙ্কণ। এ কাহিনি শ্রবণ করে পুণ্যতীর্থে স্নান করে সিংহল যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতে দেখি শ্রীমন্তের নৌকার কাণ্ডারীদের। এ সব বর্ণনা কোথাও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেনি, বরং মূল কাহিনির গল্পরসকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করেছে অনেকখানি।

মনুর বিধান অনুযায়ী নারী তিন কালে তিন ধরনের পুরুষ কর্তৃক পরিচালিত হতো। যেমন—কুমারী অবস্থায় পিতা, বিবাহিত হলে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্র নারীর উপর অধিকার স্থাপন করার দাবিদার। চণ্ডীমঙ্গলের বণিক খণ্ডের খুল্লনার জীবনও এই ছকের বাইরে ছিল না। প্রাচীন কালে নারী তার জীবনসঙ্গী নির্বাচনে স্বয়ম্বরা হওয়ার যে স্বাধীনতা ভোগ করত, মধ্যযুগে নারী সেই অধিকার হারিয়েছিল। কন্যার মতামত কোনো গুরুত্ব পেত না। এর ফলে উদ্ভূত দাম্পত্য সমস্যাকে মেয়েদের নিজের দুর্ভাগ্য তথা ভবিতব্য হিসাবে মেনে নিতে হতো। পিতার ইচ্ছার যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত খুল্লনাকে দুর্বহ দুঃসহ দাম্পত্য জীবনযাপনে বাধ্য হতে হয়েছিল। নতুন সংসারে পা দিয়েই খুল্লনা বুঝেছিল ভবিষ্যৎ সংকটের আভাস। রাজার জন্য ধনপতি স্বর্ণপিঞ্জর তৈরি করতে গৌড় নগরে গেলে লহনা সপত্নী বিদ্বেষের আগুনে খুল্লনাকে যেন পোড়াতে থাকে। দুর্বলা ও লীলাবতীর সহায়তায় লহনার বিবিধ নিগ্রহে খুল্লনার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল।

জায়ারূপে অঙ্কন করতে গিয়ে আমরা খুল্লনার মধ্যে যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করি তা হলো খুল্লনা স্বামীপ্রেমে একনিষ্ঠ। সতীনের দ্বারা পীড়িত হয়েও কখনো ধনপতিকে সে দোষারোপ করেনি। এ ছাড়া নিজের অধিকারের বেড়ায় স্বামীকে ঘিরে রাখতে চায়নি।

খুল্লনা ছিল কোমল-স্বভাবা। সংসারে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে তাকে লড়াই করতে হয়েছে প্রতিনিয়ত। স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্য-সুখ বেশিদিন ভোগ করার সুযোগ সে পায়নি। স্বামীর গৌড় নগরে গমনে তাকে বেদনা-বিহ্বল জীবনযাপন করতে হয়। সপত্নী কোন্দলে লহনা তাকে প্রহার পর্যন্ত করে। প্রতিহিংসায় অন্ধ লহনা খুল্লনার পট্টবস্ত্র-সহ সমস্ত আভরণ কেড়ে নিয়ে তাকে পরতে দেয় খুঞা বসন, আর নির্দেশ দেয় ছাগল রক্ষণ করতে। খুল্লনার খাবার জোটে আধপেটা, রাত্রিকালে তার স্থান হয় ঢেঁকিশালে।

রামায়ণের সীতার সঙ্গে তুলনীয় খুল্লনার এই দুঃখদহন ও দুঃখসহন ভাবটি। সীতা যেমন বারবার বিনা কারণে দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিল, খুল্লনার জীবনও কেটেছিল অনেকটা সেই রকম। স্বামীর অবর্তমানে খুল্লনাকে আমরা বেদনা-কাতর হতে দেখি। সীতা ও খুল্লনা দুইজনেই স্বামীর সোহাগ পেলেও দুঃখ-যন্ত্রণাকে এড়াতে পারেনি। রাবণ সীতাকে হরণ করে অশোক কাননে বন্দিনী করে যেমন লাঞ্ছিত করেছিল, তেমনি লহনা স্বামীর অনুপস্থিতিতে খুল্লনাকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারে জর্জরিত করেছিল। লক্ষ্য করার বিষয়, দুই পতিব্রতা নারীকেই নিজেদের সতীত্বের অক্ষুণ্ণতার পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। অন্তিম পরিণতিও দুইজনের প্রায় অনুরূপ। সীতা ধরিত্রীর সন্তান। উত্তরাকাণ্ডের শেষে সীতাকে পাতাল প্রবেশ করে যেমন স্বস্থানে ফিরে যেতে দেখা যায়, তেমনি ধনপতি উপাখ্যানের শেষ দিকে বণিক গৃহে আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হওয়ার পর দেবী চণ্ডীর নির্দেশে খুল্লনা তথা স্বর্গের নর্তকী রত্নমালা পুনরায় দেবলোকে প্রত্যাবর্তন করেছে। রামায়ণের সীতার সঙ্গে খুল্লনার এই সাদৃশ্য বোধহয় কবিকঙ্কণ মুকুন্দের দৃষ্টি এড়ায়নি। কবি মুকুন্দ দুর্বলা দাসীর মুখে লহনা-নির্যাতিতা খুল্লনার প্রতি সান্ত্বনা-বাণী প্রকাশ করতে সীতার বনবাস প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন।

আমার বচনে তুমি শুন ইতিহাস।
রামের বচনে সীতা গেল বনবাস।।[১১]

লহনা যেন রামায়ণের কৈকেয়ী। কৈকেয়ী সতীন-পুত্র রামচন্দ্রকে জটা-বল্কল পরিয়ে বনে পাঠিয়ে ছিলেন। লহনা স্বামীর একটি জাল চিঠি দেখিয়ে সতীন খুল্লনাকে ঢেঁকিশালে শয়ান, একবেলা আধপেটা আহার এবং খুঞা বস্ত্র পরিধান করিয়ে বনে ছাগল চরাতে পাঠিয়েছিল। গৃহের নিরাপদ আশ্রয় থেকে খুল্লনা বিচ্যুত হলে বন্য প্রকৃতির শ্যামল প্রদেশ খুল্লনাকে আশ্রয় দিল। রাবণ যখন সীতাকে হরণ করেছিল, সেই সময় অপহৃতা সীতা তরু-পল্লবের কাছে অনুনয় করেছিল রামচন্দ্রকে সংবাদ দেওয়ার জন্য। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে—

হায় বিধি কি করিলে ফেলিলে বিপাকে।
এমন না দেখি বন্ধু সীতারে যে রাখে।।
বনের ভিতর যত আছ বৃক্ষলতা।
রামেরে কহিও গেল তোমার বনিতা।।[১২]

ধনপতিকে নিজের দুঃখময় জীবনের সংবাদ দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল খুল্লনাও। সীতার মতো বৃক্ষলতাকে নয়, সে কোকিলকে অনুরোধ করেছিল তার স্বামীর কাছে যাওয়ার জন্য—

সদাগর আছেন জথা কেহ নাহী জায় তথা
এই বনে ডাক অকারণ।[১৩]

সীতা ও খুল্লনা উভয়েই প্রকৃতি-দুহিতা। প্রকৃতির শ্যামশ্রীর মধ্যে উভয়ের চরিত্র মাধুর্য আরও বিকশিত হয়েছে। রাবণ-গৃহে বসবাসের জন্য সীতাকে বারবার সতীত্বের পরীক্ষায় বসতে হয়েছিল। খুল্লনাকেও নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের সামনে নানা পরীক্ষা দিতে হয়েছিল অন্তঃপুরের বাইরে বনে ছাগল চরানোর জন্য। তাকে জলে ডুবানো হলো, সর্পদ্বারা দংশন করানো হলো, অবশেষে জতুগৃহে রেখে অগ্নি-সংযোগ করা হলো। কিন্তু কিছুই হয়নি তার। সতীত্বের জোরে সকল পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে নারীর চরিত্র সন্দেহাতুর বলে চিহ্নিত হলে তাকে সতীত্বের পরীক্ষা দিয়ে নির্দোষ প্রমাণ করতে হতো। আসলে সীতা, বেহুলা ও খুল্লনা তিনজনেই সমজাতীয়া নারী।

এ কথা স্বীকার্য, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের মধ্যে মঙ্গলকাব্যগুলিতে রামায়ণের নানা অনুষঙ্গের ব্যবহার অধিক দেখা যায়। এই মঙ্গলকাব্যগুলি দেশজ সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের কাব্য। তাই কৃত্তিবাসের বাঙালি জীবনের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিকে মঙ্গলকাব্যের কবিরা তাদের কাব্যে ব্যবহার করেছেন যথার্থভাবে। বলাবাহুল্য, রামায়ণের অনুষঙ্গকে তারা যথাযথ আত্তীকরণ করে নিতে পেরেছিলেন।

সূত্রনির্দেশ:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি, (১৯৯৬), (সম্পা.), *কবি মুকুন্দরাম-বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী*, প্রথম ভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ২২২।
২. *তদেব*, পৃ. ২৪৮-২৪৯।
৩. *তদেব*, পৃ. ২৬৩।
৪. *তদেব*, পৃ. ২৬৬।
৫. *তদেব*, পৃ. ২৭২।
৬. *তদেব*, পৃ. ৪০০।
৭. *তদেব*, পৃ. ৪০১।
৮. সেন, সুকুমার, (২০০১), (সম্পা.), *কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল*, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ. ২৪১।
৯. *তদেব*, পৃ. ২৪১।
১০. *তদেব*, পৃ. ২৪৩।
১১. নস্কর, সনৎকুমার, (২০১৪), (সম্পা.), *মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী: ধনপতি উপাখ্যান*, বিদ্যা, পৃ. ২৭।
১২. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ, (১৯৮৯), (সম্পা.), *কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ*, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১৪৫।
১৩. সেন, সুকুমার, (২০০১), (সম্পা.), *কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল*, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ. ১৪৪।